ATHENA, VOLUME V, JULY 2021 C.E. (ISSN: 2454-1605) pp. 124-134
www.athenajournalcbm.in

স্ব-অনুবাদে "বনলতা সেন": কাব্যাত্মার বহুবিম্ব

দীপেশ প্রামাণিক*

প্রাপ্ত: ১৬/০৬/২০২১ পরিমার্জন: ২৮/০৬/২০২১ গৃহীত: ০৩/০৭/২০২১

সংক্ষিপ্তসার: *জীবনানন্দের কবিতা বললেই অনিবার্যভাবে মনে পড়বে "বনলতা সেন" কবিতাটি। কবি নিজেই নিজের এই বহুখ্যাত কবিতাটির ইংরেজি অনুবাদ করেছেন। মূল কবিতার পাশাপাশি কবির স্ব-কৃত অনুবাদের মধ্য দিয়ে বনলতা সেনের বহুবিম্বকে খুঁজে দেখার চেষ্টা করা গেছে এই নিবন্ধে। অনুবাদের ক্ষেত্রে কবি এই কবিতাটিকে কেন নির্বাচন করলেন, ইংরেজিতেই বা কেন অনুবাদ করলেন এবং অনূদিত কবিতাটি কতটা মূলের অনুসারী—এ সমস্ত কিছুই অত্যন্ত জরুরি প্রসঙ্গ। জীবনানন্দ তাঁর সমগ্র কবিজীবনের প্রতিনিধিস্থানীয় কবিতাই অনুবাদ করতে চেয়েছেন। বাঙালিদের ভিতর সৎ পাঠকের অভাব দেখে তিনি হতাশ হয়েছেন। নিজের কবিতা ইংরেজিতে অনুবাদের মধ্য দিয়ে তিনি পৌঁছতে চেয়েছেন বিশ্বের বৃহত্তর পাঠকসমাজের কাছে। মূল কবিতায় বনলতা সেনের প্রজ্ঞার উল্লেখ না থাকলেও ইংরেজি অনুবাদে তা সংযোজিত হয়েছে। কবির অনুবাদভাবনার আলোয় অনূদিত কবিতাটিকে মূলের পাশে রেখে তার নানা তলকে স্পর্শ করার চেষ্টা আছে এখানে। আলোচনার পরিধিতে এসেছে অপরাপর প্রাসঙ্গিক কবিতার অংশবিশেষ। কবিতাটি অনুবাদের ক্ষেত্রে জীবনানন্দ বারংবার সময় ও চর্চার অভাবের কথা বলেছেন। অনুবাদের জন্য নির্ভর করতে চেয়েছেন বুদ্ধদেব বসু বা অমিয় চক্রবর্তীর উপর। নিজের অনুবাদ নিয়ে তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন না, মনে সর্বদা জেগে থেকেছে সংশয়। সেই সংশয়ের দোলা কাব্যাত্মার বহুবিম্বের ভিতর থেকে বনলতা সেনকে চিনে নিতে সাহায্য করে।*

সূচক শব্দ: *অনুবাদভাবনা, বনলতা সেন, শান্তি ও প্রজ্ঞা, অনুবাদকের সংশয়।*

* স্টেট এডেড কলেজ টিচার, বাংলা বিভাগ, ড. বি. আর. আম্বেদকর কলেজ, নদীয়া।
e-mail: dipesh.bengali87@gmail.com

বনলতা সেন

হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে,
সিংহল সমুদ্র থেকে নিশীথের অন্ধকারে মালয় সাগরে
অনেক ঘুরেছি আমি; বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতে
সেখানে ছিলাম আমি; আরো দূর অন্ধকারে বিদর্ভ নগরে;
আমি ক্লান্ত প্রাণ এক, চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন,
আমারে দু দণ্ড শান্তি দিয়েছিল নাটোরের বনলতা সেন।

চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা,
মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য; অতিদূর সমুদ্রের পর
হাল ভেঙে যে নাবিক হারায়েছে দিশা
সবুজ ঘাসের দেশ যখন সে চোখে দেখে দারুচিনি-দ্বীপের ভিতর,
তেমনি দেখেছি তারে অন্ধকারে; বলেছে সে, 'এতদিন কোথায় ছিলেন?'
পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন।

সমস্ত দিনের শেষে শিশিরের শব্দের মতন
সন্ধ্যা আসে; ডানার রৌদ্রের গন্ধ মুছে ফেলে চিল;
পৃথিবীর সব রঙ নিভে গেলে পাণ্ডুলিপি করে আয়োজন
তখন গল্পের তরে জোনাকির রঙে ঝিলমিল;
সব পাখি ঘরে আসে—সব নদী, ফুরায় এ-জীবনের সব লেনদেন;
থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন।[১]

BANALATA SEN

Long I have been a wanderer of this World.
Many a night
My route lay across the sea of Ceylon somewhere winding to
The ocean of Malay.
I was in the dim world of Vimvisar and Asok, and further off
In the mistiness of Vidarbha.
At moments when life was too much a sea of sounds—
I had Banalata Sen of Natore and her wisdom.

I remember her hair dark as nights at Vidisha,
Her face: image of Sravasti; the pilot
Undone in the blue milieu of the sea
Never twice sees the earth of grass before him.
I have also seen her, Banalata Sen of Natore.

When day is done, no fall somewhere but of dews
Dips into the dusk; the smell of the sun is gone
Off the kestrel's wings. Light is your wit now
Fanning fireflies that pitch the wide things around.
I am ready with my stock of Tales
For Banalata Sen of Natore.[3]

ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র জীবনানন্দ দাশ কর্মজীবনে মূলত ইংরেজির অধ্যাপকরূপেই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কলেজে কাজ করেছেন। ইংরেজি সাহিত্যের পাশাপাশি ইংরেজি ভাষার মধ্য দিয়ে বিশ্বসাহিত্যেরও তন্নিষ্ঠ পাঠক ছিলেন তিনি। অল্প বয়সে কবি ইংরেজিতেও কবিতা লিখেছেন, পরবর্তীতে আর সেই চেষ্টা করেননি। তবে পরিণত বয়সে নিজের বেশ কিছু কবিতার ইংরেজি অনুবাদ করেছেন। এখন জীবনানন্দের কবিতা বললে প্রথমেই অনিবার্যভাবে মনে পড়বে "বনলতা সেন"-এর কথা। এবং কবি যখন নিজেই সেই কবিতার ইংরেজি অনুবাদ করেন, তখন মূলের পাশাপাশি সেই অনুবাদের মধ্য দিয়ে বনলতা সেন কীভাবে বহুবিম্বিত হয়ে ওঠেন—তা পাঠকহৃদয়ে অপার কৌতূহল জাগিয়ে তোলে।

প্রভাত কুমার দাস সম্পাদিত *পত্রালাপ: জীবনানন্দ দাশ* গ্রন্থে জীবনানন্দের অনুবাদ সম্পর্কিত যে ক'টি চিঠি পাওয়া যায়, তার সবগুলিই বুদ্ধদেব বসু অথবা দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়কে লেখা। তার কারণ এঁরা ইংরেজিতে অনূদিত আধুনিক বাংলা কবিতার সংকলন প্রকাশের সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জড়িয়ে ছিলেন। ১৯৪২ নাগাদ হ্যারল্ড অ্যাক্টন ইংরেজি তর্জমায় আধুনিক বাংলা কবিতার সংকলন প্রকাশের উদ্যোগ নেন, তা শেষপর্যন্ত বাস্তবায়িত হয়নি। এই সংকলনে অন্তর্ভুক্ত হওয়া প্রসঙ্গেই ১০/১০/৪২ তারিখে বুদ্ধদেব বসুকে লেখা চিঠিতে "বনলতা সেন"-এর অনুবাদের কথা উঠে আসছে। অর্থাৎ, ১০/১০/৪২ তারিখের অব্যবহিত পূর্বে কবি কবিতাটির অনুবাদ করেছেন। ডিসেম্বর ১৯৪৫-এ দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত *Modern Bengali Poems*-এ জীবনানন্দ দাশের স্ব-অনূদিত "Banalata Sen"-এর পরিবর্তে মার্টিন কার্কম্যানের অনুবাদ গৃহীত হয়। *Modern Bengali Poems* সংকলনগ্রন্থের জন্য মার্টিন কার্কম্যান জীবনানন্দের অপরাপর তিনটি কবিতার পাশাপাশি "বনলতা সেন" অনুবাদ করেন। সেটি "Banalata Sen" শিরোনামে ঐ সংকলনটির অন্তর্ভুক্ত হয়। মার্টিন কার্কম্যানের অনুবাদ প্রসঙ্গে ১৪/০৯/৪৪ তারিখে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়কে লেখা চিঠিতে জীবনানন্দ দাশ নিজের অভিমত ব্যক্ত করছেন:

> Kirkman-এর Banalata Sen খুবই ভালো হয়েছে, সর্বান্তঃকরণে অনুমোদন করছি। এই কবিতাটির এক জায়গায় 'raising her bird's-nest eyes' আছে, 'পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে'র এত বেশি literal translation না করে কিছুটা ভাবানুবাদ করতে পারা যায় না কি? বাংলায় আমি নীড় নয়—নীড়ত্বের সঙ্গে চোখের তুলনা করেছিলাম। O, Kite মন্দ হয়নি। O, Kite ও If I were এ বাংলার নদী গাছ ইত্যাদির নাম তুলে দিয়ে 'pool', 'time' প্রভৃতি ঢুকিয়ে কি ভালো হল? হয়তো ভালো হল। বিদেশীদের জন্যে। তাদের মতামত মূল্যবান।[৩]

নিজের কবিতা ইংরেজিতে অনুবাদের ক্ষেত্রে সংকলনের সম্পাদকদের প্রত্যক্ষ ভূমিকা তো ছিলই, সেইসঙ্গে জীবনানন্দ নিজের সামগ্রিক কবিজীবনের প্রতিনিধিস্থানীয় কবিতাই অনুবাদ করতে চেয়েছেন। এভাবে স্বল্প পরিসরের মধ্য দিয়ে অথচ নিজের কবিতাভুবনের সামগ্রিক মাত্রাকে ছুঁয়ে থেকে জীবনানন্দ অবাঙালি ভারতীয় পাঠকের কাছে এবং বিশ্বের সাধারণ পাঠকের কাছে পৌঁছতে চেয়েছেন। বাঙালিদের ভিতর সৎ পাঠকের অভাব দেখে তিনি হতাশ হয়েছেন। সেই ক্ষোভ থেকে কবি মনে হয় নিজের কবিতা ইংরেজিতে অনুবাদের মাধ্যমে বিশ্বের বৃহত্তর পাঠকসমাজের কাছে পৌঁছতে চেয়েছেন। এ প্রসঙ্গে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো, ইংরেজি অনুবাদে কবি বাংলার নদীর নাম, মাসের নাম কিংবা ক্ষেত্রবিশেষে গাছ ও পাখির নাম ইত্যাদি মুছে ফেলে বাংলার বিশিষ্ট আত্মপরিচয়কে বিপন্ন করতে চাননি, বরং ঐকান্তিকভাবে রক্ষা করতে সচেষ্ট থেকেছেন। ভারতের প্রাদেশিক ভাষাগুলির সাহিত্য ক্রমশ ইংরেজিতে অনূদিত হলে 'ভারতীয় সাহিত্য'-এর পরিচয়ও যে ক্রমশ স্পষ্ট ও সংহত হয়ে উঠবে, এমন ভাবনা নিশ্চয়ই তাঁর মনে কোন-না-কোনভাবে কাজ করেছে। এবং শৈশব থেকে বেড়ে ওঠার মধ্য দিয়ে তাঁর কবিসত্তায় বাংলা ও ইংরেজি ভাষা এবং সেই ভাষার সাহিত্য নিয়ত মিথস্ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে গেছে। জীবনানন্দের কাছে ভালো কবিতা লেখা অল্প কয়েক মুহূর্তের ব্যাপার নয়, কবিতাটিকে প্রকৃতিস্থ করে তুলতে তাঁর সময় লাগে। বুদ্ধদেব বসু ও দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়কে লেখা চিঠিগুলোতে স্ব-অনুবাদের ক্ষেত্রে জীবনানন্দ বারংবার সময় ও চর্চার অভাবের কথা উল্লেখ করে স্ব-কৃত অনুবাদের প্রতি তাঁর অতৃপ্তি ও সংশয়কে ব্যক্ত করেছেন; এবং অনুবাদের জন্য নির্ভর করতে চেয়েছেন বুদ্ধদেব বসু ও অমিয় চক্রবর্তীর উপর। ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের নিবিড় পাঠক এমনকি

অধ্যাপক হয়েও কবি বারংবার সময় ও চর্চার অভাবের কথা বলেছেন, আসলে এসবকে ছাপিয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে এক অনুবাদকের সংশয়। অনুবাদে মূল কতটা রক্ষিত হলো এবং অনূদিত রূপটি কবিতা হিসাবে কতখানি সফলতা পেলো, বোধ হয় সেই নিয়ে তাঁর কবিমনে সর্বদা সংশয় জেগে থেকেছে। কবিতা সম্বন্ধে বড় সত্যার্থী আলোচনা সমালোচকদের পরিবর্তে কবিদেরই করা উচিত বলে জীবনানন্দ মনে করতেন। এখন কবিতার অনুবাদকের সম্বন্ধে তাঁর কোন অভিমত খুঁজে পাওয়া যায় না। কিন্তু তাঁর মানসিক প্রবণতা বিবেচনা করলে অনুধাবন করতে অসুবিধা হয় না যে, কবিতার অনুবাদক সম্পর্কে তিনি বলতে পারতেন— কবিতার অনুবাদককেও হতে হবে কবিস্বভাবের অধিকারী কিংবা অন্তত দুটি ভাষায় পারঙ্গম কবিরাই কবিতার অনুবাদ করবেন। এখন জীবনানন্দের এই সার্বিক অনুবাদভাবনাকে অবলম্বন করে কবির স্ব-অনূদিত "Banalata Sen"-এর গভীরে ডুব দেওয়া যাক।

১৯৩৪ চিহ্নিত একটি খাতায় "বনলতা সেন" কবিতাটির পূর্ণাঙ্গ পরিমার্জিত রূপটি দেখা যায়। ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দে (পৌষ ১৩৪২) *কবিতা* পত্রিকার প্রথম বর্ষ দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত হয় জীবনানন্দের বহুখ্যাত এই কবিতাটি। কবিতাভবন থেকে 'এক পয়সায় একটি' শীর্ষক গ্রন্থমালার অন্তর্ভুক্ত বারোটি কবিতার সংকলন *বনলতা সেন* নামে প্রকাশিত হয় পৌষ ১৩৪৯ বঙ্গাব্দে (ডিসেম্বর ১৯৪২)। পরে সিগনেট প্রেস কর্তৃক কাব্যগ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় শ্রাবণ ১৩৫৯ বঙ্গাব্দ তথা ১৯৫২ খ্রিস্টাব্দে। সিগনেট প্রেস-এর *বনলতা সেন*-এ কবিতাভবন সংস্করণের ১২টি কবিতার সঙ্গে *মহাপৃথিবী*-র ২টি এবং ১৬টি নতুন কবিতা অন্তর্ভুক্ত হয়। সুতরাং বনলতা সেনকে ঘিরে কবির ভাবনাজগৎ প্রায় মৃত্যুকাল অবধি জায়মান থেকেছে। হ্যারল্ড অ্যাক্টনের সংকলনের জন্য জীবনানন্দ "বনলতা সেন" প্রথম ইংরেজিতে অনুবাদ করেন ১০/১০/৪২ তারিখের অব্যবহিত পূর্বে। কিন্তু নিজের করা এই অনুবাদ নিয়ে তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন না। প্রায় দু'বছর বাদে ২৩/০৮/৪৪ তারিখে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়কে লেখা চিঠিতে কবি জানাচ্ছেন— "আমি আপনাকে লিখেছিলাম 'বনলতা সেনের' অনুবাদ ভালো হয়নি, অন্য অনুবাদ পাঠাব। পাঠালাম, এইটিই নেবেন।"[৪] সম্ভবত এই সময়ে জীবনানন্দ "বনলতা সেন" কবিতাটির পূর্বতন অনুবাদের উপর কাটাছেঁড়া করে পরিমার্জনা করেছেন। সেকারণেই *বনলতা সেন: ষাট বছরের পাঠ* গ্রন্থের সম্পাদক সৈকত হাবিব কবিকৃত অনুবাদটির বিকল্প পাঠ উল্লেখ করছেন।[৫] স্বভাবতই কৌতূহল জাগে, কবিকৃত অনুবাদটিতে মূল কবিতা কতখানি রক্ষিত হয়েছে, নাকি তা মূলেরই সম্প্রসারণ? অথবা ইংরেজি অনুবাদে "বনলতা সেন"-এর কাব্যাত্মা কি নবজন্ম লাভ করেছে? বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে, মূল কবিতা এবং তার ইংরেজি অনুবাদ লেখার মধ্যে কালগত ব্যবধান প্রায় আট থেকে দশ বছরের।

বাংলা ও ইংরেজি দুটি ভাষাই ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাবংশের অন্তর্গত হলেও উভয়ের মধ্যে ধ্বনিতাত্ত্বিক ও রূপতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্যের ভিন্নতা এতোখানি যে, একটি থেকে আরেকটিতে অনুবাদ করা মোটেই সহজসাধ্য নয়। এবং অনুবাদ প্রসঙ্গটি যদি হয় কবিতাকে ঘিরে, তবে কাজটুকু কঠিনতম হয়ে ওঠে। কবিতায় অভিধার্থকে ছাপিয়ে গিয়ে ব্যঞ্জনার্থই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। এখন মূল কবিতার কোন একটি শব্দের ব্যঞ্জনার্থের যে সামগ্রিক পরিসর, অপর ভাষাটিতে সেই অর্থপ্রকাশক সমতুল্য শব্দ খুঁজে পাওয়া প্রায়ই সম্ভব হয় না। শুরুতেই বলা যেতে পারে কবিতাটির নাম নিয়ে। ব্যক্তিনামের অনুবাদ হয় না, তাই ইংরেজি অনুবাদে নামটির লিপ্যন্তর করা হয়েছে। পদবীসহ বিশিষ্ট পরিচয় নিয়ে বনলতা সেন নাম্নী নারী পাঠকচিত্তে অমোঘ আবেদন জাগিয়ে তোলেন, বিশেষ পরিচয়ে সংলগ্ন থেকেও পাঠককে নিয়ে যান নির্বিশেষ লোকে। এবং তাঁর নামের মধ্যে যে মাধুর্য ও গভীরতা রয়েছে, ভিনদেশী পাঠকেরা তা অনুধাবন করবেন কীভাবে! তা করতে গেলে কবিকে পাদটীকা সংযোজন করতে হতো। "কবিতার আত্মা ও শরীর" প্রবন্ধে জীবনানন্দ বলছেন— "কবি যখন ভাবাক্রান্ত হন তখন চোখ তাঁর ছবি দেখে, কান শোনে ছন্দ এবং চোখও অনুভব করে যেন ছন্দবিদ্যুৎ...।"[৬] এই প্রবন্ধেই জীবনানন্দ পয়ারকে 'বাংলা কবিতার প্রাণ ও আত্মা' রূপে এবং মহাপয়ারকে আধুনিক বাংলা কবিতার একটা বিশিষ্ট লক্ষণ হিসাবে উল্লেখ করছেন। এবং এই লক্ষণটি তাঁর নিজের কবিতাতেই সমধিক প্রস্ফুটিত। "বনলতা সেন" কবিতাটি ৮+৮+৬ মাত্রার মহাপয়ারে রচিত এবং কবিতাটির স্বরভঙ্গি, চলন ও আত্মার সঙ্গে এই ছন্দোবন্ধ ওতপ্রোত হয়ে আছে। এই ছন্দ ব্যতিরেকে কবিতাটিকে ভাবাই যায় না। কিন্তু ইংরেজি ও বাংলার মধ্যে ভাষাগত ভিন্নতা এতটাই যে, মূল কবিতাকে

রক্ষা করে তার ছন্দস্পন্দন অনুবাদে সঞ্চারিত করা অসম্ভব। সেরকম কোনো চেষ্টা না করে কবি কবিতাটির গদ্য অনুবাদ করেছেন। ফলে মূল কবিতায় বিষয়ের অনুসারী যে ক্লান্ত টানা ছন্দস্পন্দন, তা অনুবাদে অনুপস্থিত। মূল বাংলা কবিতাটি তিনটি স্তবকে বিন্যস্ত, প্রতিটি স্তবকে ছ'টি ক'রে পঙ্‌ক্তি কখ কখ গগ এই অন্ত্যমিলে বিন্যস্ত। কবিকৃত অনুবাদটি তিনটি স্তবকে বিন্যস্ত হলেও পঙ্‌ক্তি সংখ্যায় হেরফের ঘটেছে এবং যতিচিহ্নেরও পরিবর্তন ঘটে গেছে। অথচ কবিতায়, বিশেষত জীবনানন্দের কবিতায়, যতিচিহ্নের ব্যবহার অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। অন্যদিকে অন্ত্যমিল রক্ষা করা সম্ভব হয়নি বলে মূল কবিতার ঐশ্বর্য ইংরেজি অনুবাদে অনেকখানি ফিকে হয়ে গেছে, হারিয়ে গেছে সংহতি।

অনুবাদ কবিতাটির শুরুতে কবি 'হাজার বছর ধ'রে' অংশটুকু অনুবাদ করেছেন 'Long' শব্দের প্রয়োগে। 'দীর্ঘকাল ধ'রে'—এমন অর্থজ্ঞাপক ক্রিয়া-বিশেষণ রূপে 'Long' শব্দটির ব্যবহার ইংরেজিতে বহুপ্রচলিত। অন্যদিকে মূল কবিতার প্রথম পঙ্‌ক্তিতে 'আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে'-র সঙ্গে 'হাজার বছর ধ'রে'-র ব্যবহার সাধারণের মধ্যে প্রচলিত নয়, আক্ষরিক অর্থ বিবেচনা করলে অর্থের কোনো সঙ্গতি খুঁজে পাওয়া যায় না। 'হাজার বছর' শব্দের মধ্যে কালগত যে ব্যাপ্তি ও বিস্ময় আছে, 'Long' শব্দটি তা প্রকাশ করতে পারে না। আসলে ব্যক্তিমানুষের আয়ুষ্কাল পেরিয়ে এক সভ্যতা থেকে আরেক সভ্যতায় উত্তরপ্রবেশের মধ্য দিয়ে মানবের যে ক্রমযাত্রা, 'হাজার বছর' কথাটুকু সেই ব্যাপ্ত কালগত পরিসরের ভিতর পাঠককে দাঁড় করিয়ে দেয়। এই দীর্ঘকালীন যাত্রায় যাত্রিকের সত্তায় ক্লান্তি আসা তো স্বাভাবিক। 'আমি ক্লান্ত প্রাণ এক' বলেই তো বনলতা সেনের কাছ থেকে দু-দণ্ডের শান্তি যেমন কাঙ্ক্ষিত হয়ে ওঠে, তেমনি বনলতা সেনও হয়ে ওঠেন আরো বেশি বরণীয় এক নারী। কিন্তু কবি 'আমি ক্লান্ত প্রাণ এক' অংশটুকু বর্জন করলেন। 'চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন'-কে জীবনানন্দ অনুবাদ করলেন—'At moments when life was too much a sea of sounds—', ইংরেজি অনুবাদের মধ্য দিয়ে মূল কবিতার বয়ানটুকুর অর্থগত তাৎপর্য আরেকটু স্পষ্টতর হয়ে উঠলো। চেতনাশূন্য সাধারণ নরনারীর নিরর্থক কার্যকলাপ ও কলধ্বনিকে ইঙ্গিত করেই কবি যেন ঐ কথা বললেন। এ প্রসঙ্গে মনে আসতে পারে চৈত্র ১৩৫৬ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত "অন্ধকার" কবিতার অংশবিশেষ:

> সূর্যের রৌদ্রে আক্রান্ত এই পৃথিবী যেন কোটি কোটি শুয়োরের আর্তনাদে
> উৎসব শুরু করেছে।
> হায়, উৎসব![৭]

এর কিছুটা পরেই এই "অন্ধকার" কবিতাতেই পাওয়া যাবে, অন্য কোন নক্ষত্রের জীব না হয়েও কবিতার কথক নরনারীর পৃথিবীকে কোনদিন চিনে উঠতে পারেননি:

> শত শত শূকরের চিৎকার সেখানে,
> শত শত শূকরীর প্রসববেদনার আড়ম্বর;
> এই সব ভয়াবহ আরতি![৮]

মূল কবিতার প্রথম স্তবকের শেষ পঙ্‌ক্তি থেকে শান্তি প্রসঙ্গ বর্জন করে কবি "আমারে দু-দণ্ড শান্তি দিয়েছিল নাটোরের বনলতা সেন"-এর পরিবর্তে অনুবাদে লিখলেন—"I had Banalata Sen of Natore and her wisdom"। স্পষ্টতই অনুধাবন করা যাচ্ছে যে, 'and her wisdom' অতিরিক্ত সংযোজন। কাঙ্ক্ষিত নারীর কাছে শান্তির উপলব্ধি প্রসঙ্গে *বনলতা সেন* কাব্যগ্রন্থে ১৯৫২-তে সংযোজিত "মিতভাষণ" কবিতাটির নিম্নোদ্ধৃত পঙ্‌ক্তিগুলি যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ:

> তোমার সৌন্দর্য নারী, অতীতের দানের মতন।
> মধ্যসাগরের কালো তরঙ্গের থেকে
> ধর্মাশোকের স্পষ্ট আহ্বানের মতো
> আমাদের নিয়ে যায় ডেকে
> শান্তির সঙ্ঘের দিকে—ধর্মে—নির্বাণে;
> তোমার মুখের স্নিগ্ধ প্রতিভার পানে।

অনেক সমুদ্র ঘুরে ক্ষয়ে অন্ধকারে
দেখেছি মণিকা-আলো হাতে নিয়ে তুমি
সময়ের শতকের মৃত্যু হলে তবু
দাঁড়িয়ে রয়েছ শ্রেয়তর বেলাভূমি:
যা হয়েছে যা হতেছে এখুনি যা হবে
তার স্নিগ্ধ মালতীসৌরভে।[৯]

স্পষ্টতই বৌদ্ধধর্মের অনুষঙ্গ মিশে আছে এ কবিতার শরীর ও আত্মায়; আবার বৌদ্ধধর্মে প্রজ্ঞা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ইংরেজি অনুবাদে 'and her wisdom' আকস্মিক ও নিঃসম্পর্কিত মনে হলেও শান্তির সঙ্গে প্রজ্ঞার গভীর যোগাযোগ রয়েছে। প্রজ্ঞার অধিকারিণী বলেই তো বনলতা সেন কবিতার ক্লান্ত যাত্রীকে শান্তি দিতে পারেন। ইংরেজি অনুবাদে 'আমি ক্লান্ত প্রাণ এক' এবং 'দু-দণ্ড শান্তি' অংশগুলো কবি বর্জন করায় প্রেমিক-প্রেমিকার পারস্পরিক সম্বন্ধের মধ্যে যে নির্ভরশীলতা, নিবিড়তা ও অনিবার্যতা—তা কিছুটা হলেও ক্ষুণ্ণ হয়। কিন্তু 'and her wisdom' সংযোজিত হওয়াতে মূল কবিতার পাশে অনুবাদটি রেখে সমন্বিতভাবে পাঠ করলে কবিমানসের সঙ্গে সঙ্গে বনলতা সেনের স্বরূপও স্পষ্টতর হয়ে ওঠে। "১৯৪৬-৪৭" কবিতায় কবির স্পষ্ট উচ্চারণ—'জ্ঞানের বিহনে প্রেম নেই।'[১০] আরো স্পষ্টতর উচ্চারণ *আলোপৃথিবী* কাব্যগ্রন্থের "আলোকপত্র" কবিতাটির অন্তিম স্তবকে:

জ্ঞান হোক প্রেম, প্রেম শোকাবহ জ্ঞান
হৃদয়ে ধারণ ক'রে সমাজের প্রাণ
অধিক উজ্জ্বল অর্থে করে নিক অশোক আলোক।[১১]

প্রেমিকাকে প্রজ্ঞারূপিনী হিসাবে দেখার উদাহরণ বিরল নয়। জীবনানন্দের কাছে প্লেটো যেমন অতিপরিচিত, তেমনি দান্তে তাঁর অন্যতম প্রিয় কবি। *জীবনানন্দ দাশের কাব্যসমগ্র* গ্রন্থের শুরুতে "জীবনানন্দ দাশের কবিতা" শীর্ষক দীর্ঘ প্রবন্ধে সম্পাদক দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিশ্লেষণ এ প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য—

> কিন্তু দান্তের যে পরাদৃষ্টি বা vision, চূড়া স্পর্শ করেছে যা পারাদিসোয়, অন্তত *মহাপৃথিবী*র প্রথমার্ধ পর্যন্ত জীবনানন্দ তা অনুসরণ করেছেন। ঠিক ধর্মিষ্ঠতা নয় বা এলিয়টের *Ash Wednesday*র সমর্পিত পর্যায়ও নয়, প্রেম তাঁর কবিতায় প্রথমবোধেই অন্তর্গত চিত্তের দিশারী। কায় যে দিব্য হয়ে ওঠে বা প্রেমচেতনা যে কেবল প্রেমসাধনা হয়ে ওঠে তাই নয়, প্রেমস্পর্শ পরিণামে হয়ে উঠতে পারে জ্ঞানদীক্ষা। *ভিতা ন্যুয়োভায়* যে প্রেমিকার (gracious lady) সঙ্গে কবির প্রেম বা দিব্য প্রেমের ঐকাত্ম্য, *কনভিভিয়ো* দ্বিতীয় অধ্যায়ে তার রূপক ভঙ্গ করে দান্তে তাকে বলেছেন সে হল প্রজ্ঞা বা দর্শনের প্রতীক (যে কারণে বেয়াত্রিচের বাস্তব অস্তিত্ব নিয়ে আদতে এত সংশয়)। স্বর্গের সাত ধর্মগুণের প্রতীক যে সাত অপ্সরা তাদের অনুগামিনী বেয়াত্রিচেকে কবি বলেছেন Sapientia বা প্রজ্ঞা (*পুর্গাতোরিয়ো* ৩২ সর্গ ৯৮-৯৯ এবং ৩৩ সর্গ ১৩-১৫)। প্লেতোর *Symposium*এ সোক্রাতেসকে কেন্দ্র ক'রে প্রেমতত্ত্বের যে আলোচনাচক্র সেখানে মানতিনীয় রমণী দিয়োতিমার কাছে প্রেমের এই প্রজ্ঞার পাঠ নিয়েছেন সোক্রাতেস।[১২]

লক্ষণীয় বিষয় হলো, ১৯৫২-র সংস্করণে *বনলতা সেন*-এর মধ্যে "সুচেতনা" এসে মিলছে। প্রজ্ঞার অধিকারিণী যে নারী, তিনিই তো সুচেতনা। যাঁর মুখোমুখি হওয়ার জন্য দীর্ঘ পথ পাড়ি দিতে হয়, অসহনীয় ক্লান্তিকে স্বীকার করতে হয়—কবি কিন্তু শুরুতেই তাঁর নামোল্লেখ করছেন না। বনলতা সেনের নাম উল্লিখিত হচ্ছে একেবারে প্রথম স্তবকের অন্তিমে ষষ্ঠ পঙ্‌ক্তির শেষ শব্দরূপে। এবং পাঠকের কাছেও একটু একটু করে উদ্ভাসিত হয়ে উঠছেন তিনি। তিনটি স্তবকের প্রতিটির শেষে অন্ত্যমিলসহ সেই নাম পুনরুচ্চারিত হয়ে জাগিয়ে তুলছে এক অপূর্ব সংগীত, পাঠকহৃদয়ে সঞ্চারিত করছে মুগ্ধতা ও বিস্ময়ের আবেশ। আরও লক্ষণীয়, ৮+৮+৬ মাত্রায় বিন্যস্ত মহাপয়ারের ৬ মাত্রার প্রান্তিক পর্বরূপে 'বনলতা সেন' নামটি

উপস্থিত হয়েছে; এভাবে নামটি ছন্দের সৌষম্যকেও ধারণ করে আছে। ভাষাগত বিসদৃশতার কারণে ইংরেজি অনুবাদে এসব রক্ষা করা সম্ভব হয়নি।

কবিতাটির দ্বিতীয় স্তবকে পাই চিরকাঙ্ক্ষিত বনলতা সেনের বর্ণনা। দ্বিতীয় স্তবকের প্রথম প্রঙক্তি—"চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা"; ইংরেজি অনুবাদে তা দাঁড়িয়েছে—"I remember her hair dark as nights at Vidisha"। বাংলা পঙ্‌ক্তিটিতে 'র' ধ্বনি নির্দিষ্ট দূরত্বে পুনরাবৃত্ত হয়ে সংহতি ও সৌষম্যের মধ্য দিয়ে যে মাধুর্যকে প্রকাশ করেছে, অনুবাদে সেই সুষমাকে রক্ষা করা সম্ভব হয়নি। "অতিদূর সমুদ্রের 'পর/ হাল ভেঙে যে-নাবিক হারায়েছে দিশা"-কে জীবনানন্দ অনুবাদে লিখলেন—"the pilot/ Undone in the blue milieu of the sea"। জীবনানন্দ এখানে স্পষ্টতই ভাবানুবাদের দিকে কিছুটা ঝুঁকে রয়েছেন, ভাবানুবাদ না বলে সারানুবাদ বললে যথার্থ হবে। দূর সমুদ্র পাড়ি দেওয়ার পর হাল ভেঙে যে নাবিক দিশা হারিয়েছেন, তাঁর সেই চরম বিপন্নতা কিংবা অসহায়তা পূর্বোক্ত অনুবাদে যথাযথভাবে ধরা পড়ছে না। 'নাবিক'-এর অনুবাদে কবি 'pilot' লিখলেও "নাবিক" কবিতার ইংরেজি অনুবাদে 'sailor' শব্দটি গ্রহণ করেছেন। "সবুজ ঘাসের দেশ যখন সে চোখে দেখে দারুচিনি-দ্বীপের ভিতর" কবিকৃত অনুবাদে হয়েছে—"Never twice sees the earth of grass before him"। 'দারুচিনি-দ্বীপ' উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে প্রাকৃতিক ঐশ্বর্যে ভরপুর এক আশ্চর্য ভূখণ্ড পাঠককেও দুর্নিবারভাবে আকর্ষণ করতে থাকে, তা যেন স্বাদ-গন্ধ-স্পর্শ নিয়ে পাঠকের সামনে একেবারে মূর্ত হয়ে ওঠে। অথচ অনুবাদে তা ধরা পড়লো না। কবিতার নায়ক যে ব্যগ্র আকুল দৃষ্টি নিয়ে বনলতা সেনের দিকে চাইবেন, তারই তুলনা হিসাবে তো বলা হয়েছে—"Never twice sees the earth of grass before him"। ইংরেজি অনুবাদের ওই উচ্চারণভঙ্গিতে মনে আসতে পারে "শঙ্খমালা" কবিতায় প্রায় সমধর্মী বয়ান—"এ পৃথিবী একবার পায় তারে, পায় নাকো আর।"[১৩] এরপর মূল কবিতায় আছে—"তেমনি দেখেছি তারে অন্ধকারে; বলেছে সে 'এতদিন কোথায় ছিলেন?'/ পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন।" কবির অনুবাদে তা দাঁড়িয়েছে—"I have also seen her, Banalata Sen of Natore"। অব্যবহিত পূর্বের বয়ানের সঙ্গে সাদৃশ্যবশত যে তুলনাবাচক শব্দ 'তেমনি' মূল কবিতায় আছে, অনুবাদে তা অনুপস্থিত থেকে অলংকারকে ক্ষুণ্ণ করেছে। প্রতিতুলনার কারণেই যে 'pilot' কবিতায় উপস্থিত হয়েছে, অনুবাদে তা স্পষ্ট নয়। 'তেমনি দেখেছি তারে অন্ধকারে'—এখানে অন্ধকারেরও বিশেষ তাৎপর্য আছে বলে মনে হয়, কিন্তু অনুবাদে কবি তা পরিহার করেছেন। সে প্রসঙ্গে পরে প্রবেশ করা যাবে। "বলেছে সে 'এতদিন কোথায় ছিলেন?'"—সমগ্র কবিতা জুড়ে কবিতার নায়কের সঙ্গে বনলতা সেনের এই ছোট অথচ বহু-অর্থদ্যোতক সংলাপটুকুই আছে। এই সংলাপটুকুর মধ্য দিয়ে বনলতা সেন পাঠকের সামনে আরও বেশি সজীব হয়ে ওঠেন, কবিতার নায়কের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধের ভিতর নানা রঙের আলো খেলা করে যায়। এবং কবিতার চলনেও সঞ্চারিত হয় মৃদু নাটকীয়তা। কিন্তু অনুবাদে কবি বনলতার মুখ থেকে এই কথাটুকুও কেড়ে নিলেন, ফলত অনুবাদের বনলতা সেন বোবা হয়ে যান। 'পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে' অংশটুকুও কবি অনুবাদে মুছে দেন, অথচ এটিই কবিতাটির কেন্দ্রীয় চিত্রকল্প। সমগ্র কবিতাটির ভাবনির্যাস তো এই উপমাটির মধ্যেই বিধৃত হয়ে আছে। কবিতার বিপন্ন নায়কের প্রতি বনলতা সেনের এই যে নিবিড় দৃষ্টিপাত, সেই অনুভাব তো গভীর প্রেমেরই দ্যোতক। অনুবাদে এই অংশটি গৃহীত না হওয়ার কারণে পাঠকহৃদয়ে রসের অভিব্যক্তিতে বড় ব্যাঘাত ঘটে।

তৃতীয় স্তবকের শুরুতে "সমস্ত দিনের শেষে শিশিরের শব্দের মতন সন্ধ্যা আসে" এই মূল থেকে কবি অনুবাদে অনেকখানি সরে গেলেন—"When day is done, no fall somewhere but of dews/ Dips into the dusk"। মূল কবিতায় সন্ধ্যার আগমন শিশিরের শব্দের সঙ্গে প্রতিতুলিত হয়েছে 'মতন' শব্দের দ্বারা, অনুবাদে এই তুলনাবাচক শব্দটি মুছে গেছে। এবং সন্ধ্যা পরিবর্তিত হয়েছে 'dusk' অর্থাৎ গোধূলিতে। গোধূলি জীবনানন্দের অন্যতম প্রিয় সময়, তাঁর কবিতায় তা ঘুরে ফিরে এসেছে। কিন্তু ভেবে দেখতে গেলে গোধূলি অপেক্ষা সন্ধ্যার সঙ্গেই শিশিরের কার্যকারণ সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতর। পৃথিবীর সব রঙ নিভে গেলে সন্ধ্যার অন্ধকারের প্রেক্ষাপটেই তো জোনাকির রঙ ঝিলমিল করে ওঠে! "ডানার রৌদ্রের গন্ধ মুছে ফেলে চিল"—এই উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে পাঠকের চোখের সামনে ফুটে ওঠে, দিনশেষে কোনো উঁচু

জায়গায় বসে থাকা চিল তার ডানার পালকের গভীরে মাথা ডুবিয়ে ডুবিয়ে তীক্ষ্ণ চঞ্চুতে মুছে নিচ্ছে যাবতীয় রৌদ্রের গন্ধ। মূল কবিতায় এই দৃশ্যের ভিতর চিলের যে প্রাণস্পন্দন অনুভব করা যায়, অনুবাদে পরোক্ষ বিবৃতিতে তা হারিয়ে গেছে। অনুবাদে আছে— "the smell of the sun is gone/ Off the kestrel's wings"। "পৃথিবীর সব রঙ নিভে গেলে... মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন"— কবিতার এই শেষাংশটুকুর অনুবাদে কবি মূলের পঙ্‌ক্তিবিন্যাস অনুসারে করেননি। অনুবাদে এই অংশটুকু মূল থেকে অনেকখানি বিচ্যুত হয়েছে। "পৃথিবীর সব রঙ নিভে গেলে" অনুবাদে অনুপস্থিত। "তখন গল্পের তরে জোনাকির রঙে ঝিলমিল" ইংরেজি অনুবাদে হয়েছে—"Fanning fireflies that pitch the wide things around"। স্পষ্টতই এই অনুবাদ আড়ষ্ট এবং অস্পষ্ট, 'তখন গল্পের তরে' অনূদিত ঐ পঙ্‌ক্তিতে অভাসিত হলো না। 'পাণ্ডুলিপি করে আয়োজন', 'তখন গল্পের তরে' এবং 'মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন' এই তিনটি অংশ সমন্বিত করে নিয়ে, মনে হয়, কবি অনুবাদের শেষ পঙ্‌ক্তি দুটি রচনা করেছেন:

I am ready with my stock of Tales
For Banalata Sen of Natore.

মূল কবিতার তৃতীয় তথা অন্তিম স্তবকে উত্তম পুরুষ 'আমি' প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত নন, কিন্তু উপরে উদ্ধৃত অনুবাদে 'আমি' জোরালো ভাবে ফিরে এসেছেন। 'মুখোমুখি বসিবার' অংশটুকু অনুবাদে ঠাঁই পায়নি। বিস্তৃত দেশ-কাল-পাত্রের বিচিত্র টানাপোড়েনেই তো অভিজ্ঞতার জন্ম হয়, ব্যক্তি আমি সেসবের একমাত্র নিয়ামক নয়। দীর্ঘ প্রতীক্ষা শেষে প্রিয়জনের মুখোমুখি বসে পরস্পরের সংলাপের মধ্য দিয়েই তো গল্প তৈরি হতে থাকে। সেই দ্বিরালাপকে সরিয়ে রেখে কবিতার নায়কের 'আমি' মাথা উঁচু করে দাঁড়ালে রসহানি ঘটে বৈকি! নায়ক-নায়িকার মুখোমুখি বসে গল্প করার মধ্যে যে রোমাঞ্চ ও প্রাণের আকুতি আছে, অনুবাদে তা হারিয়ে গেছে। অনুবাদে অতিরিক্ত সংযোজিত হয়েছে—"Light is your wit now"। এই 'wit' যেন নিছক বুদ্ধি নয়, বরং জ্ঞান ও চেতনা। পৃথিবীর সব রং নিভে গিয়ে চরাচর জুড়ে যখন সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে আসে, তখন যে অন্তরে চেতনার আলোবলয় জাগিয়ে নেওয়ার সময়। "Light is your wit now"— এখানে 'you' তবে কে? কবিতার নায়কেরই অপর সত্তা, এ আসলে তাঁর নিজেকেই নির্দেশনা। কবিতার নায়ক একদা যে বনলতা সেনের প্রজ্ঞার সান্নিধ্য পেয়েছেন, সেই প্রজ্ঞাকে অবলম্বন করেই দিনশেষে সন্ধ্যার আঁধারের ভিতর নিজ অন্তরে আলো খুঁজে নিতে চান। এই সন্ধ্যা তো আসলে জীবনেরই সন্ধ্যা, জীবনের পড়ন্ত বেলা, যখন "সব পাখি ঘরে আসে—সব নদী— ফুরায় এ-জীবনের সব লেনদেন"। অনুবাদে এই উদ্ধৃত অংশটুকু বাদ গেছে, বর্জিত হয়েছে 'থাকে শুধু অন্ধকার' অংশটুকুও। যদিও অন্ধকার এ কবিতায় বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

আলোচ্য কবিতাটি শুরুই হয় কবিতার নায়কের অন্ধকারে অবিরাম যাত্রার কথা দিয়ে। 'নিশীথের অন্ধকারে মালয় সাগরে', 'বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতে', 'আরো দূর অন্ধকারে বিদর্ভ নগরে'—এমন সব উচ্চারণের মধ্য দিয়ে কবিতার প্রথম স্তবকেই অন্ধকারে চারিদিক আচ্ছন্ন হয়ে ওঠে, আর তার মধ্য দিয়েই এগিয়ে চলেন ক্লান্ত প্রাণ এক যাত্রিক। যে বনলতা সেনের কাছে তিনি দু-দণ্ডের শান্তি পাবেন, সেই বনলতাকেও ঘিরে থাকে অন্ধকার—'চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা' কিংবা 'তেমনি দেখেছি তারে অন্ধকারে'। কবিতার নায়ক সেই ঈপ্সিত নারীর দীর্ঘ সান্নিধ্য পাননি, বরং তিনি রয়ে যান অধরা—রহস্যের অন্ধকারে ঘেরা। 'নাটোরের বনলতা সেন' এমন বিশিষ্ট পরিচয়ে সংলগ্ন থেকেও তিনি যেন বিস্তীর্ণ দেশকালে পরিব্যাপ্ত এক নারীসত্তা। মানবসভ্যতার অন্তঃসারের ভিতর তিনি যেন অন্তর্লীন হয়ে আছেন। তৃতীয় তথা অন্তিম স্তবক শুরু হয় দিবাবসানের কথা দিয়ে। 'শিশিরের শব্দের মতন সন্ধ্যা আসে', 'ডানার রৌদ্রের গন্ধ মুছে ফেলে চিল' এবং পৃথিবীর সব রঙ নিভে আসে। এ জীবনের সব লেনদেন যখন ফুরিয়ে আসে, যখন ঘরে ফেরার পালা, জীবনের সেই সন্ধ্যাকালে আলোপ্রদায়ী বনলতা সেনের স্মৃতি ঝিলমিলিয়ে ওঠে। তখন "থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন।" বোঝা যায় শারীরিক উপস্থিতি নিয়ে বনলতা সেন কাছে নেই, সেই বিরহ সমাচ্ছন্ন অন্ধকারে বনলতাকে ব্যাপ্ত করে তোলে। তখন 'তুমি'-'আমি'-র ভেদ যেন লুপ্ত হয়ে আসে। এভাবে কবিতাটি এক অন্ধকার থেকে শুরু করে আরেক অন্ধকারে এসে পৌঁছয়। *জীবনানন্দ দাশের কাব্যসমগ্র* গ্রন্থে সম্পাদক দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় 'বনলতা সেন'-এর

একটি আনুষঙ্গিক কবিতা বিন্যস্ত করেছেন, তার থেকে উদ্ধৃত অংশটুকুর আলোয় মূল কবিতাটি পাঠকের কাছে স্পষ্টতর হয়ে উঠতে পারে:

বনলতা সেন, তুমি যখন নদীর ঘাটে স্নান করে ফিরে এলে
মাথার উপরে জ্বলন্ত সূর্য তোমার,
অসংখ্য চিল, বেগুনের ফুলের মতো রঙিন আকাশের পর আকাশ
তখন থেকেই বুঝেছি আমরা মরি না কোনো দিন
কোনো প্রেম কোনো স্বপ্ন কোনো দিন মৃত হয় না
আমরা পথ থেকে পথ চলি শুধু—ধূসর বছর থেকে ধূসর বছরে—
আমরা পাশাপাশি হাঁটতে থাকি শুধু, মুখোমুখি দাঁড়াই: তুমি আর আমি...।[১৪]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজির অধ্যাপক ফকরুল আলম, যিনি জীবনানন্দের কবিতার অন্যতম ইংরেজি অনুবাদক, "On Translating Jibanananda Das's Poetry" শীর্ষক গ্রন্থভূমিকায় "বনলতা সেন"-এর কবিকৃত অনুবাদ সম্পর্কে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মতামত প্রকাশ করেছেন:

> Despite Jibanananda Das's sensitivity to Bose's emendations though, a comparison of his own translation of a poem such as "Banalata Sen" with the original reveals that as a translator he himself often took the easy way out and simplified his verse considerably in rendering them into English. The suggestive quality of the verse, the striking comparisons, and the music which comes from sound patterning, the soft rhythms, and the unobtrusive but eloquent rhymes have all but disappeared in his English version.[১৫]

Bose বলতে এখানে বুদ্ধদেব বসুকে বোঝানো হয়েছে। বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, "বনলতা সেন"-এর কবিকৃত অনুবাদটি খুব অল্প সময়ের ভিতর তাড়াহুড়ো করে লেখা। উপরন্তু জীবনানন্দ সেভাবে কখনো অনুবাদের কাজে নিজেকে নিমগ্ন রাখেননি। তাই এই কবিতাটি অনুবাদের সময় তিনি যেমন স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেননি, তেমনি মনে জেগে থেকেছে সংশয়। সেকারণে বারংবার নির্ভর করতে চেয়েছেন বুদ্ধদেব বসু বা অমিয় চক্রবর্তীর উপর। কবির অনুবাদে মূল কবিতার ছন্দ, অন্ত্যমিল, কখনো গোটা পঙ্‌ক্তি বা শব্দ, গুরুত্বপূর্ণ চিত্রকল্প ইত্যাদি বর্জিত হয়ে অনুবাদটি অনেকখানি সমতলীয় হয়ে উঠেছে। স্বয়ং বনলতা সেনই হয়ে পড়েছেন নিষ্প্রভ ও নিষ্প্রাণ। আসলে ভিন্নভাষী পাঠকের কাছে সহজে পৌঁছতে চেয়ে জীবনানন্দ নিজের মূল কবিতা থেকে সরে গেছেন। তিনি ঝুঁকে থাকতে চেয়েছেন ভাবানুবাদের দিকে, কিন্তু তাঁর ভাবানুবাদ হয়ে দাঁড়িয়েছে সারানুবাদের মতো। ফলে মূল কবিতার ব্যঞ্জনা ও ভাবৈশ্বর্য অনেকখানিই হারিয়ে গেছে। তবুও মূল কবিতা ও অনুবাদটিকে পাশাপাশি রেখে পাঠ করলে পাঠকের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে "বনলতা সেন"-এর বহু প্রতিবিম্ব, জীবনানন্দকে অনুধাবনের আরো অনেক দরজা খুলে যায়। এভাবে বহুবিম্বিত "বনলতা সেন" হাজার পাঠসম্ভাবনা নিয়ে পাঠকহৃদয়ে হানা দেয়, কবির অনুবাদভাবনার আলোয় সেই বহুমুখী সম্ভাবনাগুলোকে অনুধাবনের চেষ্টা করা গেলো।

সূত্র নির্দেশ:

১। বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ, (২০১৫), (সম্পা.), *জীবনানন্দ দাশের কাব্যসমগ্র*, দে'জ পাবলিশিং, পৃ. ১৪১।

২। *তদেব*, পৃ. ৮৩৪।

৩। দাস, প্রভাতকুমার, (২০১৭), (সম্পা.), *পত্রালাপ: জীবনানন্দ দাশ*, এবং মুশায়েরা, পৃ. ১৪২।

৪। *তদেব*, পৃ. ১৩৮।

৫। হাবিব, সৈকত, (২০০৪), (সম্পা.), *বনলতা সেন: ষাট বছরের পাঠ*, কথাপ্রকাশ, পৃ. ১৮।

৬। দাশ, জীবনানন্দ, (২০১৫), *কবিতার কথা*, সিগনেট প্রেস, পৃ. ৪৪।

৭। বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ, (২০১৫), *পূর্বোক্ত*, পৃ. ১৫৪।

৮। *তদেব*, পৃ. ১৫৫।

৯। *তদেব*, পৃ. ১৬৩।

১০। *তদেব*, পৃ. ২৮৬।

১১। *তদেব*, পৃ. ৫৫২।

১২। *তদেব*, পৃ. [১০১]-[১০২]।

১৩। *তদেব*, পৃ. ১৪৭।

১৪। *তদেব*, পৃ. ৮৬০।

১৫। Alam, Fakrul (Trans.), (2003). *Jibanananda Das: Selected Poems with an Introduction, Chronology, and Glossary*, The University Press Limited, p. 10.